

'পিতার অস্থি'র সন্ধানে

এ সংখ্যার প্রচ্ছদের অস্থির ওপর রাখা হাতটি অনল রায়হানের। ৩০ লক্ষ মানুষের অস্থি মিশে আছে এ দেশের মাটিতে। মিরপুরের নতুন বধ্যভূমিতে পাওয়া অস্থিগুলো আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ২৯ বছর আগের প্রেক্ষাপটে। যখন সদ্য মানুষ হারিয়েছে স্বজন। লাশেরও সন্ধান পায়নি। আগে মানুষটিকে খুঁজেছেন। এখন অনল রায়হানরা অস্থিতেই অনুভব করছেন পিতার অস্তিত্ব। অনল রায়হান এখানে পিতা জহির রায়হানের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে আরো কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন...

পনেরো-ষোলো বছর আগে। ১৯৮৪-৮৫ সাল। বেশ সকালের দিকে। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফ, না কাটা রুক্ষ চুলের একটি লোক এসে উপস্থিত হলেন মোহাম্মদপুর, ১/১৯ হুমায়ূন রোডের একতলা একটি বাড়িতে। সেখানে থাকেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুমিতা দেবী। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের দেড় মাস পর ঢাকার মিরপুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রকার-সাহিত্যিক জহির রায়হানের প্রথম স্ত্রী। বাড়িতে সুমিতা দেবী এবং তার সন্তানরা তখন ঘুমিয়ে।

আগন্তুকের পোশাক প্রায় ভিখিরির মত। বাড়ির কাজের লোকের কাছে বললেন, জহির রায়হান ফিরে এসেছে। আজকেই যে কোনো সময় এখানে আসবে। আর কিছুই না বলে রহস্যময় আগন্তুক চলে গেলেন। পাড়ার কনফেকশনারি দোকান থেকে আগন্তুক সুমিতা দেবীর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে রাত হলো। সুমিতা দেবী অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। তখন স্বাধীনতার পনেরো বছর হয়ে গেলেও বিশ্বাস করেন না, জহির রায়হান মৃত। ফিরে আসবে। সে কথা বলতেন সন্তানদের। সন্তানরা বড় হয়েছে। তাদের বিশ্বাস পিতা জহির রায়হান মৃত। সেখানে মৃদু দ্বিধা এনে দিয়েছিল রহস্যময় আগন্তুক। রাত পড়লো। সকাল হলো। জহির রায়হান এলেন না। সেই আগন্তুকও নয়। ... .

পনেরো বছর পর। ১৯৯৯ সালের ২৭ জুলাই। কলেজ গেইট থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের মুসলিম বাজারের একটি মসজিদের পেছনে কনস্ট্রাকশনের খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বেরিয়ে পড়লো পুরনো একটি কুয়ার মুখ। সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা। ভাঙা হলো স্ল্যাব। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লো মানুষের তিনটি মাথার খুলি, হাড়গোড়। শুরু হলো খনন কাজ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের তত্ত্বাবধানে। সাহায্য করছে '৭১-এর স্মৃতি পরিষদ। আগস্টের ১০ তারিখ পর্যন্ত এই কুয়া এবং আশপাশের মাটি থেকে পাওয়া গেল ৫টি মাথার খুলি, মানুষের ৬শ'র বেশি অখণ্ড ও ভেঙে যাওয়া হাড়। খনন চলছে কুয়ার আশপাশের পুরোটাই। ছিল ডোবা। আরও লাশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। খনন কাজ চালানো হবে পুরো জায়গাটিতেই।

এক সময় মানুষ স্বজনের লাশ খুঁজে ফিরেছে সারা বাংলাদেশের অজস্র বধ্যভূমিগুলিতে। ২৯ বছর পর এই ঘটনা যেন প্রমাণ করলো, খোঁজা শেষ হয়ে যায়নি। কতগুলি মানুষের খুলি, কতগুলো হাড় তাৎক্ষণিকভাবে চেনা যাবে না কিছুই। তবু ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকেও এই কুয়ার পাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন '৭১-এ লাশ না পাওয়া, নিখোঁজ ছেলে-পিতা-ভাই অথবা বোনের আপনজন কেউ।

ফরেনসিক এবং পরে ডিএনএ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যাবে এই খুলি আর হাড়গুলি কোন মানুষের পরিচয় বহন করছে।

লাশ পাওয়া যায়নি জহির রায়হানের। পাওয়া যায়নি সে সময়ের মিরপুরের এডিশনাল এসপি জিয়াউল হক লোদীর। পাওয়া যায়নি আরও অনেক শহীদের লাশ। মুক্তিযুদ্ধের ২৯ বছর পর তাঁরা কি এইভাবে ফিরে আসছেন? সুমিতা দেবীকে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল ডিএনএ পরীক্ষা এবং সম্ভাবনার কথা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকেছেন। তারপর ভেঙে পড়েন কান্নায়। তার বিশ্বাস ভেঙে যেতে হয়ত আর কয়েক মাসের অপেক্ষা করতে হতে পারে। গোটা মিরপুর এলাকায় অনেক অনাবিষ্কৃত বধ্যভূমি রয়ে গেছে এখনও। কোথায় তিনি রয়েছেন? জিয়াউল হক লোদীর মেয়ে জাহানারা খান লোদী বলেছেন, কুয়ার ভেতরে খাকি পোশাকের অংশ পাওয়া গেছে। পাওয়া

গেছে এমন একটি মাথার খুলি যাতে দাগ। তিনি শুনেছেন তার পিতা শহীদ হয়েছেন মাথায় গুলি লেগে। হতবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছেন এই প্রতিবেদকের দিকে। তবে কি ইনিই তার পিতা?

৩০ জানুয়ারি ১৯৭২

জহির রায়হানের অগ্রজ শহীদ সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে আলবদররা ধরে নিয়ে যায় একাত্তরের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর কায়েতটুলীর বাড়ি থেকে। জহির রায়হান তখন ভারতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসে তিনি জানতে পারেন। শহীদুল্লাহ কায়সারকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। মেনেও চলতেন। খোঁজ-খবর নিতে নিতে চলে আসেন বাহাত্তরের ৩০ জানুয়ারি এই মিরপুরেই। খবর পেয়েছেন শহীদুল্লাহ কায়সার বেঁচে আছেন মিরপুরে। মিরপুর তখনও বিহারি, কিছুসংখ্যক পলাতক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকারদের দখলে। জহির রায়হান ৩০ জানুয়ারি সকালে ঢুকে যান অগ্রজের খোঁজে শত্রু বেষ্টনীতে। আর ফিরে আসেননি।

কেউ বললো হারিয়ে গেছেন, কেউ বললো মারা গেছেন। তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। তারা কিছুই জানাতে পারলেন না। এই ভাবে ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তন ঘটলো। একে একে এলো বিএনপি এবং এরশাদ সরকার। জহির রায়হানের পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। এরশাদ সরকার উচ্ছেদের চিঠিতে বললেন, 'যেহেতু জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মারা গেছেন সেহেতু তাকে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বলা যাবে না।' সুতরাং সুমিতা দেবী তার কলেজ গেটের বাসা থেকে দ্বিতীয়বার উচ্ছেদ হলেন।

পিতা নিখোঁজ অথবা মিরপুরের কোথাও নিহত এইটুকু সত্য মেনে নিয়েই জহির রায়হানের চার সন্তানও অতীত করে ফেললো পিতার স্মৃতি ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২কে। বছর ঘুরে ৩০ জানুয়ারি এলে মাঝে মাঝে সন্তানদের পিতার নিখোঁজ রহস্য সমাধান করার কথা বলতেন জহিরের কোনো ভাই কিংবা আত্মীয়। স্কুলে পরিচয় জানতে পেরে হঠাৎ কখনও একজন শিক্ষক বলে উঠতেন, 'কিভাবে যে তোমার বাবা হারিয়ে গেলেন...।' শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিল ছাত্রটি, 'নিখোঁজ ব্যক্তিকে কি শহীদ বলা যায়?'

দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলিতে, টেলিভিশন কিংবা রেডিওতে 'নিখোঁজ জহির রায়হান'-এর মিস্ট্রি নিয়ে বলা হলো, কোনো তদন্ত হলো না, রহস্যের সমাধান হলো না। শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তানদের স্মৃতি কথা নিয়ে প্রকাশিত 'আমার বাবা' গ্রন্থে জহির রায়হানের এক সন্তান লিখলেন, 'আমার আশা এবং বিশ্বাস আমাদের এই চার ভাইয়ের মধ্যে অন্তত একজন হলেও জহির রায়হানের নিখোঁজ রহস্যের সমাধান করবে।'

সন্ধানের শুরু

১৯৯৯, ৬ আগস্ট। জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়ার আনুমানিক ৯ হাজার ৯ শ' ৩৬ দিনে মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে পৌঁছে এক দোকানে জিজ্ঞেস করা হলো মুসলিম বাজার কোন দিকে। উত্তরদাতার বয়স ২৫-এর কাছাকাছি। চোখে গাঢ় করে সুরমা দেয়া। বাংলায় মুসলিম বাজারের দিক নির্দেশ করলেন কিন্তু উচ্চারণে মনে হলো অবাঙালি। আরও এগিয়ে গিয়ে এবার একটা



এখন আর শুধু কুয়া নয়, পুরো জায়গাটাই একটি বধ্যভূমি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে

সেলুন। উত্তর যিনি দিলেন তিনিও বাঙালি নন, বিহারি। লম্বা রাস্তার ঢালের মধ্যে মুসলিম বাজারে পৌঁছানোর পর নূরী মসজিদ যিনি চিনিয়ে দিলেন তাকেও বাঙালি বলে মনে হলো না। প্রতিবেদককে একটু থমকে যেতে হলো। ১৯৬৫ সালে তৈরি মসজিদটির পেছন দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভিড়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীকে দেখে হঠাৎ করেই স্বস্তি হলো।

প্রায় বেশিরভাগ মানুষ যাকে কুয়া ভেবে আসছে সেটা আসলে নির্মীয়মাণ অট্টালিকার বেইজমেন্ট। বেইজমেন্টের আট-দশ ফুট নিচে দেখা যাচ্ছে আবিষ্কৃত সেই কুয়ার মুখ। সেখানে জমে থাকা কাদাপানি। সেইদিকে তাকিয়ে ভাবতে কেমন এক অনুভূতি হলো, অনেক বছর আগে জহির রায়হান কিংবা জিয়াউল হক লোদীর লাশ এর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে।

এইদিন কুয়া থেকে তখন পর্যন্ত যে হাড়গোড় বা কাপড় উদ্ধার করা হয়েছে তা একটি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা। পাওয়া গেছে ১৯৬৭ সালের পাকিস্তান আমলের এক পয়সার একটি কয়েন। কাপড়ের কিছু ছেঁড়া অংশ। দেখে প্রথমেই মনে হলো ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান কি এই পোশাক পরেই এখানে এসেছিলেন? জহির রায়হানের আত্মীয়রা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

'৭১ স্মৃতি পরিষদের প্রেসিডেন্ট এমএম কায়সারের কাছে জানতে চাওয়া হলো এই এলাকা এখনও বিহারি অধ্যুষিত কিনা। কায়সার জানালেন, ১১ এবং ১২ নম্বর সেকশন মিলিয়ে এখনও লক্ষাধিক বিহারির বসবাস রয়েছে। এখন অবশ্য বাঙালির সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত ১৯৮০ সালের পর থেকেই এদিকে অনেক বেশি সংখ্যায় বাঙালিরা আসতে শুরু করে। এই অসংখ্য বিহারিদের মধ্যে একাত্তর-বাহাত্তরের নিরীহ বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারীদের কি কেউই নেই? এমন অনেক পঞ্চাশোর্ধ এবং বৃদ্ধ বিহারি চোখে পড়লো একাত্তরে যাদের টগবগে তরুণ থাকার কথা। একাত্তর এবং বাহাত্তরের জানুয়ারি পর্যন্ত এখানে এমন একজনও শারীরিক-ভাবে সামর্থ্যবান বিহারি পাওয়া যাবে কি যিনি বাঙালি হত্যাযজ্ঞে প্রতি-বাদ করতে চেয়েছিলেন?

কায়সারকে অনুরোধ করতে তিনি একটি ছেলেকে দিলেন ভেতরের দিকে বিহারি পট্টিগুলি ঘুরিয়ে দেখাবার। সেই সময়ে এখানে ছিলেন এরকম কাউকে পাওয়া যায় কিনা। প্রতিবেদকের নোট বইতে একটি নাম লেখা আছে আজগর আলী। যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী। এই আজগর আলীর পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা প্রতিবেদক দেখতে চাইলো।

ঐদিনই ঢাকার শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকে লেখা হয়েছে, আজগর আলী নামে একজন বিহারিই হয়ত জহির রায়হানকে টেলিফোন করে এখানে আনিয়েছিলেন। এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখের কারণ, আজগর আলী ঢাকার চলচ্চিত্রে একজন নৃত্য পরিচালক ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অনেকে ধারণা করছেন, জহির রায়হানের কোনো ছবিতেও হয়ত তিনি কাজ করে থাকবেন। সুতরাং আজগরের কথায় বিশ্বাস করে জহির রায়হান এখানে আসতে পারেন। সঙ্গের ছেলেটি বললো, 'আপনাকে মাস্তানার বাড়ি দেখিয়ে দিতে পারি, এই বিহারিও বড় খুনী ছিল।'

একটি রিকশা নিয়ে বাজার ছেড়ে ভেতরের দিকে যেতে যেতে নোট করে নিতে হলো দুটো সূত্রের। এক, জহির রায়হান কি পোশাক পরে মিরপুরে গিয়েছিলেন? দুই, আজগর আলী আসলে নৃত্য পরিচালক কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা। তিন, মাস্তানা।

বাজার ছাড়ানোর দু' মিনিটের মাথায় মাঝারি আকৃতির একটি মাঠের কাছে রিকশা থামাতে বললো সঙ্গী তরুণ। মাঠের চারদিকে এখনও অনেকগুলি আইয়ুব খানের করা বিহারিদের জন্য

...একটি ছোট কোয়ার্টার রয়েছে। ফাঁকে ... কোথাও হাল আমলের দোতলা-চারতলা ... রয়েছে। এই মাঠটিকে বলা হয় পুরনো ... নতুন ঈদগা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ... এবং সেটা ১০ নম্বর, পল্লবী রাস্তার পাশেই, ... ভেতরে নয়। এই মাঠেরই এক পাশের ... বাড়ি হচ্ছে মান্নানার। গেটের সামনে ... ছিলেন একজন মহিলা। ছেলেটি বললো, ... স্ত্রী। মান্নানা মারা গেছেন ৩১ জানুয়ারি ... ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। আরপর আলীর পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেল না। অবশ্য এম এ ... এই প্রতিবেদককে মান্নানার বাড়িটাকেই ... আলীর বাড়ি বলেছিলেন।

রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে বিহারিপল্লীর রাস্তার পাশে পড়লো আটকে পড়া পাকিস্তানির মুভমেন্টের ছোট এক ঘরের একটি অফিস। ছাদে উড়ছে সংগঠনের পতাকা যা প্রায় পাকিস্তানি জাতীয় পতাকারই অনুরূপ। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল দেয়াল জুড়ে একসারি কাচে বাঁধানো পোস্টার সাইজ ফটোগ্রাফ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি একমাত্র অফিস ডেস্কের ঠিক পেছনে অর্থাৎ সেন্টার পয়েন্টে। তার ডান পাশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বড় আকারের, মোনাজাতরত ছবি। জিন্নাহর বাম দিকে পাকিস্তানের প্রয়াত সামরিক শাসক জিয়াউল হক, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ থেকে শুরু করে আরও কয়েকজন পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতার ছবি। ঘরের একপাশের দেয়ালে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ছবি। অফিসে তখন দু'জন বিহারি লোক ছিলেন। খুব অবস্থাপন্ন বলে মনে হয় না। এদের একজন এখানে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং বাহাত্তরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেও বাস করতেন। এখানে যুদ্ধ হয়েছে, অনেক নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে, তিনি কেমন কি কি দেখেছেন? উত্তরে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের লোকটি বাংলায় বললেন, 'আমি কিছুই দেখি নাই... সেই সময়ে আমার মাথা ঠিক ছিল না... ঐ নয়-দশ মাস শুধু রুটি আর নুন খেয়ে একদম ঘরের মধ্যে বসে থেকেছি। আধ্যাত্মিকতা করতাম। পাগল থেকে পুরো সুস্থ হলাম এই কয়েক বছর আগে। তারপর বিয়া করেছি।' জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি যুদ্ধের গোলাগুলি, বোমার শব্দও শোনেননি? উত্তরে বললেন, 'না... হ্যাঁ একটু আধটু শুনছি... কিন্তু মাথা ঠিক ছিল না।' ঠিক হলো, সন্ধ্যার পর সংগঠনের একজন কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে কথা বলা যাবে, যিনি ভালো বলতে পারবেন।

রিকশায় ১২ নম্বর সেকশনের এই ভেতরের অলি-গলিতে ঘুরতে ঘুরতে ঢাকার আর কোনো এলাকার সঙ্গে মেলানো গেল না। ডানে-বাঁয়ে প্রায়ই উর্দু শোনা যাচ্ছে। বাংলাও আছে। বাঙালিরা আছে। দোকানের নাম 'নয়ন' কিংবা





জহির রায়হান ও এসপি জিয়াউল হক খান লোদী ঃ ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ একসঙ্গে নিখোঁজ হয়

'বিচিত্রা'র পাশাপাশি 'আল হেলাল', 'মিল্লাত' অথবা 'কায়দে-বুলবুল'। ১২ নং সেকশনের এই রাস্তাগুলিতে বেবিট্যাক্সি মাঝেমধ্যে চোখে পড়ছে। রিকশা চলছে। অন্য যানবাহন নেই। পুরো পরিবেশ যেন ত্রিশ বছর আগের ঢাকার কোনো এলাকার মত।

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের মাইক্রোবাসে ফেরার পথে, সন্ধ্যায় এক স্থানীয় বিহারি নেতার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতেই আক্কু চৌধুরী সোজা নিষেধ করলেন। বললেন, 'যার সঙ্গেই দেখা করতে চান সেটা দিনের বেলায় করুন। ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু সন্ধ্যার পর ঐ এলাকায় ঘোরাঘুরি না করাই ভালো।'

বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজ করতে এসে ২৯ বছর আগে ১৯৭২-এ এই এলাকায় নিখোঁজ হয়েছিলেন জহির রায়হান। ২৯ বছর পর ১৯৯৯ তে পরের প্রজন্মের আরেকজন সাংবাদিক জহির রায়হানের নিখোঁজ রহস্য খুঁজতে এসে নিখোঁজ হওয়ার আশংকায় পড়লেন? কথাটা ভেবে অস্বস্তি হলো।

প্যান্ট-শার্ট-কার্ডিগান আর স্যান্ডেল

মহাখালী থাকেন জহির রায়হানের চাচাতো ভাই সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হানের সঙ্গে একটা পর্যায় পর্যন্ত সঙ্গী যারা ছিলেন শাহরিয়ার কবির তাদের একজন।

৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান মিরপুরে ঢুকেছিলেন সাদা শার্ট, ছাই রঙের ফুল প্যান্ট, ঘিয়ে রঙের উলের কার্ডিগান এবং পায়ে স্যান্ডেল পরে। বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিক থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে শোনা যাচ্ছিল, মিরপুরে শহীদুল্লাহ কায়সারসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকেই হয়ত জীবিত আটকে রাখা হয়েছে। জহির রায়হানের মাথায় প্রবলভাবে চিন্তা ঘুরছিল মিরপুর ঢোকার। এরকম অবস্থায় ৩০ জানুয়ারি খুব সকালে কায়েতটুলীর বাসায় জহিরের কাছে একটি টেলিফোন আসে। বলা হয়, মিরপুরে শহীদুল্লাহ কায়সারকে আটকে রাখা হয়েছে এবং জহির রায়হান এলে তাকে উদ্ধার করতে পারবেন। এই ধরনের ফোন আগেও এসেছে। এই রহস্যজনক টেলিফোন কে করেছিলেন সে সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির কিছু বলতে পারলেন না। ঐদিনই সকালে দুটি প্রাইভেট কারে জহির রায়হান, তার ছোট ভাই জাকারিয়া হাবিব, চাচাতো ভাই শাহরিয়ার কবির এবং বাবলু শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সারের ভাই, জহির রায়হানের দ্বিতীয় স্ত্রী সুচন্দার ভাইসহ সেক্টর টু-এর কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মিরপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন।

একটি গাড়ি চালাচ্ছিলেন জহির নিজে অন্যটি জাকারিয়া হাবিব। টেকনিক্যা... ইনস্টিটিউটের সামনে দিয়ে মিরপুরের দিকে ডা... ঘুরলো দুটো গাড়ি। রাস্তার দুই পাশে তখন খো... মাঠ, উঁচু-নিচু জলাভূমি। মাঝে মাঝে কয়েক মাত্র বাড়ি-ঘর। গাড়ি দুটো একটু এগুতে গাবতলীর দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালা... শুরু করলো বিহারিরা। সে সময় উল্লেখযো... সংখ্যক পাকসেনাও মিরপুরে বিহারিদের ছত্রছা... গা ঢাকা দিয়েছিল। খুবই দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ত... শেষ পর্যন্ত ২ নম্বর সেকশনে মিরপুর থা... পৌঁছান। সেখানে উপস্থিত ভারতীয় ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসাররা সিভিলিয়ান দেখে খুবই বিরক্ত হন। বেসাম... লোকদের ঐ এলাকায় ঢোকার অনুমতি ছিলো... সবাইকে চলে যেতে বলা হলো। শেষ পর্যন্ত জ... রায়হান একা থেকে যাওয়ার অনুমতি পান। ...িয়ার কবিরসহ বাকি সবাই ফিরে আসেন। ...

রায়হানের গাড়িটি রেখে আসা হয়।

এই গাড়িটি একদিন পর রহস্যজনকভাবে পাওয়া যায় রমনা পার্কের সামনে। উদ্ধার করেন জাকারিয়া হাবিব। তিনি এখন বেঁচে নেই।

শাহরিয়ার কবির বলেন, 'ঐ দিন সকালেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পুলিশ মিরপুরে অ্যাকশনে যায়। ১১ নম্বর থেকে ১২ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি মূল রাস্তার পাশেই কোথাও পুরো দল অ্যামবুশড হয়। প্রায় সবাই মারা যান। যে কয়েকজন পালিয়ে আসতে পারেন তাদের কথায় জানা যায়, 'বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একজন বেসামরিক লোক ছিলেন তবে তিনি জহির রায়হান কিনা তারা জানেন না।' শাহরিয়ার কবির বললেন, ফকির শফিউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি মিরপুরের আদি বাসিন্দা। মিরপুরে সেই সময় কত সংখ্যক বিহারি থাকতেন, রাজাকার ছিল এ বিষয়ে তিনি বলতে পারবেন। কোনো সূত্র হয়ত তিনি দিতে পারবেন। যোগাযোগ করা যাবে কিভাবে? একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুলের তিনি দুলাভাই। পরেরদিন ফকির শফিউদ্দিনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো। তার আগে আজগর আলীর প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

আজগর আলী নৃত্য পরিচালক নন

সুমিতা দেবী এবং সুলতা দু'জনেই জানান, আজগর আলী নামে কোনো নৃত্য পরিচালকের কথা তারা শোনেননি। জহির রায়হানের কোনো ছবিতে এ নামে কোনো নৃত্য পরিচালকও ছিলেন না। গওহর জামিল, দেব কুমার, জি.এ. মান্নান, তার মেয়ে নাগমা, আলতামাশ প্রমুখ ব্যক্তিরাই সে সময় পরিচিত নৃত্য পরিচালক ছিলেন।

কিন্তু আজগর আলী চলচ্চিত্রের বাইরেও ছিলেন না। তার কাজ ছিল অনেকটা এজেন্টের মত। অল্প পুঁজির একজন প্রডিউসারের সঙ্গে অল্প পুঁজির আরেকজন প্রডিউসারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন। নিজেকে চলচ্চিত্রের প্রডিউসার হিসেবেও পরিচয় দিতেন। ৬৯-৭০-৭১ সালে এফডিসিতে তাকে দেখা গেছে নিয়মিতই। পরিচালক শিল্পী সাদিকের স্পষ্ট মনে আছে আজগর আলীর কথা। বললেন, 'আজগর আলী নামে একটি লোককেই আমরা চিনতাম। সে মিরপুরের দিকে কোথাও থাকতেন, বিহারি। যতদূর মনে পড়ছে তার বয়স চল্লিশের নিচে ছিল না। বড়বড় চোখ ছিল। দেখতে খাটো, মোটা বেশ গাট্টা গোট্টা ছিল। কিন্তু জহির রায়হান আর আজগর আলীর ক্লাসে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল। জহির রায়হানের পক্ষে তাকে চেনার কোনো কারণ ছিল বলে আমার মনে হয় না। এমন একটি লোকের কথায় জহির রায়হান মিরপুরে শহীদুল্লাহ স্যারকে উদ্ধার করতে যাবেন এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। অবশ্য সে সময় তিনি অত্যন্ত ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন।'

কিন্তু ...

ঢাকার চলচ্চিত্রে ষাট দশকের শেষ ভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিহারি বিভিন্ন শাখায় কাজ করতো। এর মধ্যে মিরপুর এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ বাঙালি হত্যার কুখ্যাত এক খুনি মাস্তানাও ছিল। সে ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় করতো। মাস্তানা, নঈম (ফিল্মের সাইনবোর্ড আঁকতো), হাসনাইন (সংগীত পরিচালক) এরকম অনেকেরই নিয়মিত আড্ডা বসতো পুরনো ঢাকার নবাবপুরের সেন্ট্রাল হোটেলে। শিল্পী সাদিক বলেন, 'আমার স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়েনি যে ৩০/৩৫ বছর আগের কথা মনে করতে পারবো না। এদের বেশির ভাগেরই বাসা ছিল তখন ঠাঁটারিবাজার, সিদ্দিকবাজার এসব এলাকায়। নঈম আহত নামে একটি ছবিও প্রডিউস করার ঘোষণা দিয়েছিল।'



মুসলিম বাজার বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত অস্থি



১৬ ডিসেম্বরের পরে মোহাম্মদপুর পুরনো ঢাকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিহারিরা দলে দলে এসে জড়ো হতে থাকে মিরপুরে। যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধস্পৃহা এদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবেই ছিল। জহির রায়হানকে মাস্তানা, আজগর আলীদের অন্য বিহারিদের থেকে অনেক ভালো ভাবেই জানার কথা। জহির রায়হান যখন জীবন থেকে নেয়া বানান তখন তো এরা এফডিসির ভেতরের লোকই। জহিরকে হত্যার সুযোগের সদ্ব্যবহার তাদের করাই স্বাভাবিক। ৬ আগস্ট শুক্রবার সকালেই শাহরিয়ার কবির ১২ নম্বর সেকশনে মাস্তানার বাড়িতে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সুতরাং পরের দিন ৭ আগস্ট শনিবার প্রথমেই শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো।

'জহির রায়হানের নাম শুনেছি'

মাস্তানার স্ত্রী কামাল জাহানা শাহরিয়ার কবিরকে বলেছেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাদের এই বাড়িতে জহির রায়হান এসেছিলো কিনা তা তিনি জানেন না। কারণ তিনি পর্দা মেনে চলতেন। বাইরের কেউ আসলে তা জানা সম্ভব ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ ও বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসে মাস্তানার কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। মাস্তানার মৃত্যু হয়েছে কিভাবে তাও জানেন না।

রহস্যজনক রফিক

আজগর আলী মাস্তানা বা এ ধরনের কোনো বিহারি যদি চাতুরতা করে জহির রায়হানকে ফোন না করে থাকে তাহলে ৩০ জানুয়ারির সেই ফোন কে করেছিল? এর ভিন্ন একটি কাহিনী শোনা গেছে সুমিতা দেবীর কাছ থেকে। রফিক নামে এক ভদ্রলোকের কথা বললেন তিনি। সে সময় যিনি ইউএসআইএস (USIS)-এর কাজ করতেন। পুরো নাম সুমিতা দেবী ভুলে গেছেন। কিন্তু এই বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে সুমিতা এবং জহির রায়হানের পরিচয় ষাটের দশকের শুরু থেকেই। রফিক ভালো হাত দেখতে জানতেন। ডিসেম্বরে ভারত থেকে দেশে ফিরে জহির রায়হান যখন অগ্রজের নিখোঁজ সংবাদে ভেঙে পড়েছেন, সে সময় এই রফিক নামে জহিরের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিক থেকেই

জহির রায়হানের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ধর্মীয় নির্ভরতা এবং আধ্যাত্মিকতা চেপে বসে। রফিক তাঁকে বারবার ক্রমাগত আশ্বাস দিয়ে থাকেন, শহীদুল্লাহ কায়সার বেঁচে আছেন। সুমিতা দেবীর কথায়, 'এই রফিকের পাল্লায় পড়ে জহির রায়হান আজমির শরীফ ঘুরে আসেন এবং সেখানে তিনি নাকি এক ধরনের নিশ্চিত আশ্বাস পান তাঁর ভাই বেঁচে আছেন। এ সময়ে হাইকোর্টের মাজারের সামনে দিয়ে যেতে-আসতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মত মাজারকে সালাম করতে শুরু করেন। প্রয়াত কথাশিল্পী এবং নির্মূল কমিটি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জাহানারা ইমামের মানসিকতাও একাত্তরে এভাবে আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হতে দেখা গেছে। তিনিও বিভিন্ন পীরের কাছে যেতে শুরু করেছিলেন। কারণটা একই। এখানে পুত্র। জহিরের ক্ষেত্রে ভাই। দুজনেই নিজের প্রিয় মানুষকে ফিরে পাওয়ার জন্য যে কোনো কিছু করতে তৈরি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষে এইভাবে সারা দেশে কত অসহায় স্বজনহারা মানুষকে অতীন্দ্রিয়বাদী হতে হয়েছে!

শাহরিয়ার কবিরকে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে একদিন রফিকের বাসায় পাঠিয়েছিলেন জহির রায়হান। রফিককে শাহরিয়ার সেদিনই প্রথম দেখেন। রফিক তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর আশ্বাস দেন, শহীদুল্লাহ কায়সার ফিরে আসবে, বেঁচে আছেন। কায়েতটুলির বাড়িতে ফিরে এসে জহির রায়হানকে শাহরিয়ার বললেন, 'জহির ভাই, আমার কাছে এ লোকটাকে ভণ্ড মনে হয়েছে'—সঙ্গে সঙ্গে গালে চড় হজম করতে হয়েছে। জহির রায়হানের মন্তব্য, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো না।'

জহির রায়হানের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন রফিক। ৩০ জানুয়ারি সকালে রফিক ফোন করেন। ফোন ধরেন জহিরের মেজ বোন। রফিক বলেন, জলদি জহির ভাইকে ডেকে দিন, শহীদুল্লাহ কায়সারকে পাওয়া গেছে। জহির রায়হান ফোন ধরতে তিনি সেই কথাগুলিই বলেন যা আজগর আলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুমিতা দেবী তখন কায়েতটুলী থাকতেন না। তিনি শুনেছেন জহিরের এই মেজো বোনের কাছ থেকেই। উনি বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। সুমিতা দেবী প্রতিবেদককে তৎকালীন ইউএসআইএস-এর রফিকের দুজন কলিগের কথা বললেন। সিদ্দিকি এবং হাই সাহেব। এদের মধ্যে সিদ্দিক নাকি জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার পর মন্তব্য করেছিলেন, 'রফিক সিআইএর এজেন্ট'। এদিকে সুমিতার ভাষ্য অনুযায়ী জহির নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই রফিক বিশেষ ব্যবস্থায় আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানেই পরে মারা যান। সিদ্দিকি বা হাই এখন কোথায় আছেন সুমিতা দেবী জানেন না।

হাই-এর কথা

বনানীতে অবস্থিত বর্তমান ইউএসআইএস অফিসে গিয়ে ইনফরমেশন ইন্সপেক্টর মাহতাব আহমেদ চৌধুরীর কাছে হাই-এর ঠিকানা পাওয়া গেল। মাহতাব এখানে সার্ভিস করছেন ১৯৮৬ সাল থেকে। রামপুরায় হাই সাহেবের বাড়ি। পুরো নাম আবদুল হাই খান। তার কাছ থেকে রফিক



১২ নং সেকশনের এই পুরনো 'জল্লাদখানা'র একাত্তরে কাজেই দুটি মসজিদ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য এবং জহির রায়হানদের সেদিনের পুলিশরা এই মাঠেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখন একটি মহল্লাকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ধরা যায়

এবং সিদ্দিকিরও পুরো নাম জানা গেল। তখনকার রফিকুল হক ছিলেন রেডিও চিফ, সাইদ সিদ্দিকি এবং হাই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম সাইডে। সিদ্দিকি কোথায় আছেন হাই সাহেব জানেন না। ১৯৯১ সালে তিনি নিজে চাকরি থেকে অবসর নেন। রফিকের ভূমিকার কথা বলতে তিনি উল্টো বলেন, 'রফিক সাহেবের মত লোকের পক্ষে এক নিচু কাজ করা কোনোভাবেই সম্ভব না। বেসিক্যালি তিনি খুবই জনপ্রিয় লোক ছিলেন ভালো মানুষ বলেই। আমেরিকায় তার মৃত্যুর পর জানাজায় যত লোকের সমাগম হয়েছিল কোনো প্রবাসী বাঙালির ক্ষেত্রে তেমনটা ভাবাই যায় না। তিনি আমেরিকা চলে যান কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় নয়। তবে তাকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে প্লেন থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল, এটা সত্যি কথা। সেটা জহির রায়হানের নিখোঁজের ব্যাপারে এলিগেশনের জন্য কিনা জানি না। তবে তিনি সহজেই এলিগেশন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন'।

ফকির শফিউদ্দিনের কথা

৬৯-৭০-৭১-এ পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স)-এর মাইক্রোবাসে করে অস্ত্র আসতো মিরপুরে বিহারিদের কাছে। ফকির শফিউদ্দিন বললেন, 'একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম দিক থেকেই মিরপুরে বিহারিরা অস্ত্র ট্রেনিং নিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সাথে একজন-দুজন করে বাঙালিদেরও হত্যা করতে শুরু করেছিল। আমরাও প্রতিশোধ নিতাম। ওরা একজন বাঙালিকে হত্যা করলে আমরা তিনজন বিহারি মারতাম। পঁয়ষট্টি সালেও মিরপুরে বাঙালি-বিহারি রায়ট হয়েছিল। একাত্তরের ২৩ মার্চ আমার বাড়িতে গোলাগুলি করলো ওরা। ২৫ মার্চ আগুন লাগিয়ে দিলো। আমি ৭ মার্চ থেকেই রাতে ১০ নম্বরে আমার বাড়িতে থাকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই এলাকায় বাঙালি যারা ছিল তারা সবাই এখান থেকে সরে পড়েছিল। এক-দুই ঘর যারা ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর এলাকায় বাঙালিদের অনেকেই নিশ্চিন্তে মিরপুরে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে শুরু করেছিল ডিসেম্বরের ১৮-১৯ তারিখ থেকে। এদের কেউই আর জীবিত ফিরে আসতে পারেনি।'

গোটা মিরপুর এলাকায় ষাট দশক থেকে ১৯৭২ সালেও তিনটি প্রভাবশালী বাঙালি পরিবার ছিল। এর একটি হচ্ছে ফকির শফিউদ্দিনদের। অন্য দু'জন হলেন হারুণ মোল্লা এবং এম এ খালেক। শফিউদ্দিন এবং হারুণ মোল্লা আওয়ামী লীগ করতেন। খালেক করতেন মুসলীম লীগ। একাত্তরে খালেক মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে মিরপুরে ৩৬ হাজার বাড়ি বানানো হয় বিহারিদের জন্য। ১, ২, ৬, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ নম্বর সেকশন ছিল বিহারিদের এলাকা। এখানে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেড় লাখ বিহারি ভোটার ছিল। অর্থাৎ প্রায় ৪ লাখ বিহারি মিরপুরের এ অঞ্চলে বাস করছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী সময়ে এ সংখ্যা কয়েক লক্ষ বেড়ে যাওয়ার কথা।

ফকির শফিউদ্দিন বলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার সাতদিন পর আমি মিরপুর এলাকার চেয়ারম্যান হই এবং আবেদন করি মিরপুর থেকে হিন্দুস্তানী বিহার রেজিমেন্ট সরানোর জন্য। কারণ এরা মিরপুরের বিহারিদের স্বগোত্রীয়। সুতরাং এই রেজিমেন্টের নিশ্চয়তায় বাঙালিরা মিরপুরে ফিরে আসতে সাহস পাচ্ছিল না।'

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই বিহার রেজিমেন্টই মিরপুরের চার্জে ছিল। সেই দিন সকালে ফকির শফিউদ্দিন টেকনিক্যাল কলেজে তার অস্থায়ী অফিসে ছিলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, জহির রায়হানরা টেকনিক্যালে পৌঁছানোর পর তিনি জানতে পারেন। তাকে জহির রায়হানের সঙ্গীদের

মধ্যে কেউ একজন বলেন যে, শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজে জহির রায়হান মিরপুর যাচ্ছেন। তিনি বারণও করেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, 'তখন আমি মাজার রোডে আমার লোকদের সংগঠিত করার কাজে লেগে যাই। সবাইকে জানাই যে, জহির রায়হান ভেতরে গেছে, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৩১ জানুয়ারি বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৭ জনসহ আমি একটি টিলার ওপর উঠি। হঠাৎ একটা গুলি এসে আমাদের একজনকে আঘাত করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে টিলার ওপর থেকে গড়িয়ে যেয়ে নিচে পানির মধ্যে পড়ি। আমাদের আর এগুনো হয়নি। ওদিকে হাফিজ মাস্টারও এগুতে পারেনি। পরে ইকবাল দারোগার সঙ্গে দেখা হয় আমার। তার কাছে জানতে পারি ১১ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে যুদ্ধ লেগেছে।'

নতুন সূত্র

এসময় অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর এই প্রতিবেদককে জানান, পুলিশের তৎকালীন এডিশনাল এসপি জিয়াউল হক লোদীর কথা। ঢাকার একটি দৈনিকেও উল্লেখ করা হয় মিরপুরে ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান এবং জিয়াউল হক লোদী একসঙ্গে ছিলেন। আসাদুজ্জামান নূর জানালেন, টেলিভিশনের নতুন কুঁড়ি শিল্পী এখন নাটকের নায়িকা ঈশিতার নানা হচ্ছেন জিয়াউল হক লোদী। এর আগে ৩০ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে জিয়াউল হক লোদীর সঙ্গে জহির রায়হানের সম্পর্কের কথা কোথাও জানা যায়নি। লোদী সাহেব কি নিখোঁজ হয়েছিলেন না লাশ পাওয়া গিয়েছিল?

ঢাকার ফার্মগেটে ঈশিতাদের বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেদক প্রথমেই পরিচিত হলেন মিসেস লোদী আনিয়া খানের সঙ্গে। তিনি এখন ষাটোর্ধ্ব। স্বামীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই জানালেন, জহির রায়হান এবং আমার স্বামী দুজনেরই লাশ কোথাও পাওয়া যায়নি। একটু পরে এলেন লোদী সাহেবের একমাত্র মেয়ে জাহানারা খান লোদী। জিয়াউল হক লোদীর একমাত্র ছেলে নইমুল হক খান লোদী কলকাতায় থাকেন। জাহানারা খান কথা বলতে গিয়েই কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'আমরা যে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবার তা আমরাই বিস্মৃত হয়েছি। কেউ আমাদের কথা জানে না। জিয়াউল হক লোদী নামে একজন মিরপুরে শহীদ হয়েছেন সে কথা যেন আমরাই শুধু জানি। টিভিতে শহীদ পরিবারদের নিয়ে যখন কোনো অনুষ্ঠান দেখায় আমরা টিভি বন্ধ করে দিই।' লজ্জিত হতে হলো প্রতিবেদককেই। জিয়াউল হক লোদীর কথা আসাদুজ্জামান নূর না বললে তিনি জানতেন না।

১৯৭১ সালের ১২ মে পাক আর্মি লোদীকে অ্যারেস্ট করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সারা দেহে নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ছাড়া পান। জানুয়ারি মাসেই এক পা খোঁড়া এবং সার্বিক ইনভ্যালিড অবস্থায়ই চাকরিতে জয়েন করেন। মিসেস লোদী জানান, একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে লোদীর ডিউটি ছিল প্রেসিডেন্ট হাউজে। প্রেসিডেন্টকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনি বুঝতে পারেন ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। এরপর ক্রমশ প্রেসিডেন্ট হাউজ আর্মি সদস্যে ভরে যেতে দেখে লোদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ওয়্যারলেসে ঘটনাটা জানান। তার এই ম্যাসেজ পাক আর্মির বেতার ট্রান্সমিশনে ধরা পড়ে যায়। জিয়াউল হক লোদীর মেয়ে জাহানারা মনে করেন, তখন থেকেই তার পিতার ব্যাপারে পাকিস্তানিদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

১৯৭২-এর ২৯ জানুয়ারি রাত দেড়টার দিকে পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন আসে। লোদীকে বলা হয় পরেরদিন ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে বিহারি-রা অস্ত্র সমর্পণ করবে তিনি যেন তাড়াতাড়ি ডিউটিতে যান। এর একটু পরেই ফোন করেন জহির রায়হান। এবং পরেরদিন জিয়াউল হক



মিরপুর ১২ নং সেকশনে মাজারের বাড়ি

লোদীদের দলের সঙ্গে তিনিও মিরপুর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লোদী ফোন রাখার পর মিসেস লোদী জিজ্ঞেস করেন কার ফোন? উত্তরে লোদী জহির রায়হানের কথা বলেন।

কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হয়েছে জহির রায়হান ৩০ জানুয়ারি মিরপুর যাওয়ার আগে জিয়াউল হক লোদীর বাসায় গিয়েছিলেন এবং তারা একসঙ্গে সেখান থেকে রওনা হন। এই তথ্য সঠিক নয় বলে জানান মিসেস লোদী। ৩০ জানুয়ারি ফজরের নামায পড়ে এক কাপ কফি খেয়েই লোদী জিপ নিয়ে বেরিয়ে যান। মিরপুর থানা থেকে সকাল ৯টার দিকে লোদী বাসায় ফোন করে বলেন, তারা এখনই ভেতরে যাচ্ছেন, জিপটা যেন দ্রুত পাঠিয়ে দেয়া হয় (জিপটা বাসায় এসেছিল একটা কাজে) জহির রায়হান সম্পর্কে এ সময় কোনো মন্তব্য তিনি করেননি। আগের দিন ২৯ জানুয়ারি লোদী তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই ৭০-৭৫ জন পুলিশ এবং আর্মি একসঙ্গে যাচ্ছি।

জহির রায়হানের সঙ্গে লোদীর মিরপুর থানায় দেখা হয়েছে এটা হয়ত বলা যায়, যেহেতু তাঁদের গাড়ি ৩০ তারিখ সকালে থানাতেই এসেছিলো। তাহলে জহির রায়হান কি জিয়াউল হক লোদীদের সঙ্গেই মিরপুরের ভেতরে ঢুকেছিলেন? তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে লোদীদের পুরো ট্রুপই মিরপুর হত্যাযজ্ঞের বলি হয়েছিল। সেই হত্যাযজ্ঞের আরো একজন ছিলেন জহির রায়হান।

রাত ৯টা-১০টার দিকে মিসেস লোদী মিরপুর থানায় ফোন করে স্বামীর খবর জানতে চান। থানা থেকে বলা হয়, এদিকে একটু গন্ডগোল হয়েছে। চিন্তার কিছু নেই ফিরে আসবেন, দেরি হবে একটু। সেই একটু দেরির যবনিকা হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই, লোদীর মৃত্যু সংবাদে।

পাওয়া যায়নি জিয়াউল হক লোদীসহ ঐ ট্রুপের বহু সৈন্যের লাশ। কিন্তু লোদী মারা গেছেন সেটা লোদীর পরিবার জেনেছেন তৎকালীন পুলিশ সার্জেন্ট নবী চৌধুরীর দেয়া তথ্যে। এই তথ্য নবী চৌধুরী অবশ্য সরাসরি লোদী পরিবারকে জানাননি। জানিয়েছেন তার অন্য কলিগ আবদুল মতিনকে। নবী চৌধুরী নাকি সেই ট্রুপের সঙ্গেই ছিলেন। তার দেয়া যে বিবরণ আব্দুল মতিনের মাধ্যমে লোদী পরিবার জেনেছে তা হলঃ সকাল ১১টার দিকে পুরো ট্রুপ ১১ ও ১২ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে থামে। এই সময় খুব জোরে হুইসেল বাজানোর শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বাড়িঘর থেকে প্রচণ্ড ফায়ারিং শুরু হয়। লোদী, নবীসহ কয়েকজন একটা ঘরের ভেতর শেল্টার নেন। সেখানেই একটা বুলেট ঘরের দেয়ালে লেগে ঘুরে গিয়ে লোদীর মাথায় আঘাত করে। তিনি পড়ে যান এবং নবী চৌধুরীকে বলেন, আমার লাশটা ছেলে-মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো। এই অ্যামবুশে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট সেলিম, পুলিশের সিএ আবদুল ওয়াহেদ, পুলিশের দারোগা কাজী আবদুল আলীমের নাম জানা গেছে। নবী চৌধুরী পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাহলে নবী চৌধুরীর তো অবশ্যই জানার কথা ওখানে জহির রায়হান ছিলেন কিনা। এবং তার কি হলো?

মিসেস লোদী এবং জাহানারা লোদী দুজনেই জানালেন, এ বিষয়ে নবী চৌধুরী কিছু বলেননি। এমনকি তারা যখন নবীর নিজের মুখ থেকে জিয়াউল হক লোদীর মৃত্যুর কথা শুনতে তার বাসায় গেছেন, নবী চৌধুরী নাকি তার স্ত্রীকে ড্রইংরুমে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। এই ২৯ বছরে একবারও নবী চৌধুরী তাদের সঙ্গে দেখা করেননি।

'নবী চৌধুরী এখন কোথায়?'

জাহানারা লোদী বললেন, 'পুলিশে তো অনেকদিন চাকরি করেছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোথায় থাকেন জানি না।'

তাহলে? ৩০ জানুয়ারির ঐ অ্যামবুশের এমন একজন সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলা যাবে না? জিজ্ঞেস করা হলো আবদুল মতিনের খোঁজ তারা জানেন কিনা। এবার ইতিবাচক খবর পাওয়া গেল।

আবদুল মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে

জানতে চাওয়া হলো, নবী চৌধুরী ৩০ জানুয়ারির ঐ যুদ্ধের ব্যাপারে তাকে যা যা বলেছেন তা কি তিনি আরেকবার প্রেসকে বলবেন? তিনি রাজি হলেন। না, জহির রায়হান সম্পর্কে নবী চৌধুরী কিছু বলেননি। নবী চৌধুরী এখন কোথায়? আশাতীতভাবে আবদুল মতিন জানালেন যে নবী চৌধুরী বর্তমানে ঢাকাতেই সাত মসজিদ রোডে অবসর জীবন-যাপন করছেন।

ঠিকানা?

আবদুল মতিন জানেন না। তবে বাড়ির লোকেশন বলে দিলেন। সেই সঙ্গে মিস্টার সুলতানের কথাও বললেন, যার বিজয় নগরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস। এই সুলতানের কাছে নবী চৌধুরীর ফোন নম্বর এবং বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ করা হলো সুলতান সাহেবের সঙ্গে। তিনি যে খবর দিলেন তাতে দমে যেতে হলো। বললেন, আমি গতকাল সন্ধ্যায়ই গিয়েছিলাম নবী চৌধুরীর বাড়ি। গিয়ে শুনলাম সাত মসজিদ থেকে নবী চৌধুরী উত্তরায় চলে গেছেন। সাত মসজিদের বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। টেলিফোন নম্বর তার কাছে নেই। তবে তিনি একদিনের মধ্যেই খোঁজ করে দিতে পারবেন। কিন্তু পুরো একদিন অপেক্ষা করে থাকার সময় কিংবা ধৈর্য ছিল না। সুলতান সাহেব অনুমত সাত মসজিদে নবী চৌধুরীর বাড়ির লোকেশন বুঝিয়ে দিলেন। এটা আবদুল মতিনের চেয়ে আরেকটু নির্দিষ্ট হলো। লক্ষ্য হলো, ভাড়াটিয়াদের কাছে নবী চৌধুরীর উত্তরার বাসভবনের ঠিকানা জানতে চাওয়া। যেহেতু ভাড়াটিয়া হয়ত জানবেন।

ধানমন্ডি পুরনো ১৫ নম্বরের ভেতরে খুব সহজেই (ঠিকানা ছাড়া) নবী চৌধুরীর বাড়ি পাওয়া গেল। দোতলা লাল রঙের বাড়ি। কলিং বেল টিপতে দোতলার গ্রিল দেয়া বারান্দার ভেতর থেকে একটু কাঁপা কাঁপা একটা স্বর ভেসে এলো 'কে?'

প্রতিবেদক জিজ্ঞেস করলো, এটা কি নবী চৌধুরীর বাসা? ভদ্রলোক 'হাঁ' বললেন। জানতে চাওয়া হলো নবী চৌধুরী কি আছেন?

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, হাঁ, আমিই নবী চৌধুরী।

অ্যামবুশের সাক্ষীর বক্তব্য

আশাই করা যায়নি নবী চৌধুরীকে এভাবে পেয়ে যাবো। নিচে গেটের কাছে প্রতিবেদক এবং ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করছে এমন কিছু শোনার জন্য, যা বাংলাদেশের মানুষ আগে শোনেনি। সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি, সাদা-কালো চেক লুঙ্গি পরে নেমে এলেন নবী চৌধুরী। সব চুল সাদা। বয়স হয়েছে বোঝা যায়। কিন্তু প্রায় ছফুট লম্বা শরীরের কাঠামো দেখলেই বোঝা যায় ইনি পাকিস্তান আমলের পুলিশ দলের একজন



১৯৭১-৭২ এর মিরপুর থানা, জহির রায়হান এখান থেকেই ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে ১১ নং সেকশনের ভেতরে যান

চৌকস ঢাকা লীগের খেলোয়াড় ছিলেন। পাকিস্তান পুলিশ দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি ট্রাফিক থাকাকালীন চাকরি থেকে অবসর নেন। পত্রিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেই কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করলেন। নিজে থেকেই গেটের খিল লাগাতে লাগাতে বললেন, 'না আমি কোনো বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমি একা থাকি, নির্বিরোধী মানুষ, ছেলেকে নিয়ে এখানে থাকি ...কোনো কথা বলতে পারবো না ...'

চেষ্টা করা হলো তাকে বোঝানোর যে তারা যদি ইতিহাসগুলো এখনও বলে না যান তাহলে আর কোনোদিনই সেই ইতিহাসের কথা জানা যাবে না ইত্যাদি। প্রায় সাত মিনিট ধরে চেষ্টা করার পর তিনি ৩০ জানুয়ারির ঘটনার কথা বলতে রাজি হলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো তিনি একবারও ভেতরে যাবার কথা বললেন না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যা বলার বলে গেলেন। নিজের থেকে বলতে চাচ্ছিলেন না কিছুই। বারবার প্রশ্ন করে উত্তর জানতে হচ্ছিল।

২০০০ : ৩০ জানুয়ারি আপনাদের সঙ্গে জহির রায়হান ছিলেন?

নবী চৌধুরী : হাঁ ছিলেন।

২০০০ : আপনি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?

নবী : জহির রায়হানকে আমি চিনতাম। জহির রায়হানের কায়েতটুলীর বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছি।

২০০০ : যুদ্ধের আগে না পরে?

নবী : দুই সময়েই।

২০০০ : ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হানকে প্রথম আপনি কোথায় দেখলেন?

নবী : মিরপুর থানায় জিয়াউল হক লোদী (অন্য কেউও হতে পারে) আমাকে বললেন, জহির রায়হান এসেছেন, তিনি তার ভাইকে খুঁজতে যাবেন। তাই আমরা যাচ্ছি।

২০০০ : এই গ্রুপের সঙ্গে আপনাকে যাওয়ার নির্দেশ কে দিলো?

নবী : সেভাবে নির্দেশ কিছু ছিল না। ৩০ জানুয়ারি পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে আমি মিরপুর থানায় আসি।

২০০০ : জিয়াউল হক লোদীদের সঙ্গে আপনিও মিরপুরে যান?

নবী : হাঁ।

২০০০ : জহির রায়হানও যান?

নবী : হাঁ উনিও ছিলেন। আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে ১১ নম্বর সেকশনে ঢুকেছি।

২০০০ : দুই দলে ভাগ হয়ে...একটু বুঝিয়ে বলবেন?

নবী : দুই দলে ভাগ বলতে একই সঙ্গে ছিলাম কিন্তু একটু আগে ও পরে। থানা থেকেই আমরা এভাবে বেরিয়েছিলাম।

২০০০ : আপনাদের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ছিল?

নবী : বেশি না। ১৫-২০ গজের মত হবে।

২০০০ : আপনি জিয়াউল হক লোদী বা জহির রায়হান কোন দলে ছিলেন?

নবী : লোদী আর জহির রায়হান ছিলেন সামনের দলে। আমি ছিলাম পেছনের দলে।

২০০০ : থানা থেকে আপনারা কটায় রওনা হয়েছিলেন?

নবী : সকাল সাড়ে আটটার দিকে।

২০০০ : আপনারা দুই দল মিলিয়ে কতজন লোক ছিলেন?

নবী : (চিন্তা করছিলেন) কি জানি খেয়াল তো নেই।

২০০০ : একশ'র বেশি? দুশ... বা একশ'র কম?

নবী : হাঁ। একশ'র কমই হবে।

২০০০ : আপনাদের মধ্যে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সৈন্য ছিল?

নবী : হাঁ। বেশির ভাগই পুলিশ ছিল। বাকিরা ছিলেন সেনাবাহিনীর।

২০০০ : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর?

নবী : না না ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল। খুবই অল্প। কয়েকজন ছিলেন সামনের দলে, কয়েকজন আমাদের সঙ্গে। পুরো দলকে গাইড করে অবাঙালী এক সামরিক লোক।

২০০০ : কিন্তু লেঃ সেলিম তো আমরা জানি ঐ গ্রুপের সঙ্গেই ছিলেন এবং শহীদ হন?

নবী : হাঁ। তাহিতো (অন্যমনস্ক).. তাহলে তো বাংলাদেশ আর্মিও ছিল।

২০০০ : তারপর কি হলো?

নবী : বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে থাকি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছাই তার পাশেই একটা খালের মত ছিল। চারদিকে বেশ কিছু একতলা-দোতলা বাড়ি ছিল। হঠাৎ করে জোরে ঘন্টা পেটানোর শব্দ হয়। দশ-পনেরো মিনিট ধরে ঘন্টা

পেটানোর শব্দ চলার...

২০০০ : আপনার সঠিক মনে আছে যে দশ-পনেরো মিনিট ধরে ঘণ্টা পেটানো হয়েছে?

নবী : হ্যাঁ। ওরকমই হবে।

২০০০ : তারপর?

নবী : তারপর হঠাৎ চারদিক থেকে ফায়ারিং শুরু হয়।

২০০০ : আপনাদের দুই দলের ওপরেই?

নবী : দুই দলের ওপরেই হয়। আমরা অনেকেই পাশে খালের পানিতে ঝাঁপ দিলাম। সেখানেও গুলি চলে। আমি সাঁতার কেটে খালের অপর পাড়ে এসে উঠি। পুলিশের ইউনিফর্ম সব খুলে ফেলে আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে অনেক ঘুরে রাত দশটার দিকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পৌঁছাই।

২০০০ : আপনি কি নিজে জিয়াউল হক লোদী গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন?

নবী : হ্যাঁ। উনি মাথায় গুলি লেগে পড়ে যান।

২০০০ : জহির রায়হান?

নবী : উনি জিয়াউল হক লোদীর সঙ্গেই ঐ দলেই ছিলেন?

২০০০ : জহির রায়হানকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছেন?

নবী : না। তখন তো আমি খালের দিকে লাফ দিয়েছি।

২০০০ : আপনার সঙ্গে থানা থেকে নিয়ে এই পুরো সময়ে জহির রায়হানের কোনো কথা হয়েছিল?

নবী : না।

২০০০ : আপনাদের সঙ্গে জহির রায়হান ছাড়া আর কোনো বেসামরিক লোক ছিল বলে মনে পড়ে?

নবী : হ্যাঁ। সম্ভবত আরও কয়েকজন সিভিলিয়ান ছিল.. আসলে এখন স্মৃতি শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে। ওসব আর স্মরণ করতেও চাই না।

২০০০ : যেখানে আপনাদের অ্যামবুশ করা হয় সেখান থেকে আপনাদের রেখে আসা গাড়ি বহরের দূরত্ব কিরকম ছিল এখন ধারণা করতে পারেন?

নবী : কয়েকশ গজ হবে।

২০০০ : কটার সময় আপনাদের ওপর ফায়ারিং হয়?

নবী : সকাল সাড়ে দশটার দিকে।

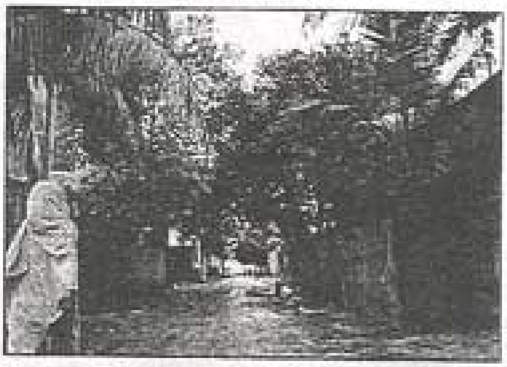
২০০০ : জায়গাটার কথা একটু বলবেন? ঠিক কোথায় আপনারা আক্রান্ত হন?

নবী : এখন আর অত মনে নেই।

তাহলে কি জহির রায়হানের মৃত্যু হয়েছে ৩০ জানুয়ারির এই ঘাতক অ্যামবুশে? জেনারেল (অব.) ইব্রাহিম তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন। তিনি লিখেছেন, 'ঐদিন মিরপুরে কি হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ বিগত ২৬ বছর ৯ মাসেও পুরোপুরি কেউই জানতে পারেনি। মিরপুরে বিহারিদের সাথে বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে বলে জানি। লেফটেন্যান্ট সেলিম, নায়েব সুবেদার আব্দুল মুমিনসহ মোট ৪০ জন সেনা সদস্য ঐ দিন মিরপুরে প্রাণ হারায়, শহীদ হয়। তাদের কারো মৃতদেহ কিংবা অস্ত্র বা অন্য কোনো চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনদিন পর একটি বিলের পাড়ে অবিকৃত একটি মৃতদেহের ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশকে লেঃ সেলিম-এর মৃতদেহ বলে শনাক্ত করা হয়। ৩০ জানুয়ারি বস্তুতই ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে যুগপৎ শোক ও কলঙ্কের দিন। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জহির রায়হানও একই দিনে এই মিরপুরে প্রাণ হারান, শহীদ হন।'

আরও দুটো সূত্র

মিরপুর থানার দারোগা কাজী আবদুল আলীম ও ৩০ জানুয়ারির ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। তার শালা এম এ হাসান প্রতিবেদককে একটু অন্য ধরনের কাহিনী শুনিয়েছেন। তিনি এই কাহিনী শুনেছেন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসা করিম দারোগার মুখ থেকে।



১২ নং সেকশনের ভেতরে একটি গলি। একরকম কোন গলি দিয়েই জহির রায়হানরা ভেতরে ঢুকেছিলেন

তার বিবরণ অনুযায়ী বিহারিরা অ্যামবুশ করার পরেও বেশ কিছুক্ষণ মুক্তিযোদ্ধা অর্থাৎ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য এবং পুলিশের সদস্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অনেকেই যখন পালিয়ে যান, আব্দুল আলীম তখন জিয়াউল হক খান লোদী, ওয়ায়েস এবং জহির রায়হানের কাছাকাছি থেকেই দুই রিভলবার দিয়ে গুলি ছুঁড়ছিলেন। করিম দারোগা এ পর্যন্ত দেখেছেন। করিম দারোগা জহির রায়হানের চেহারা চেনেন কিভাবে? করিম দারোগা ট্রুপের সঙ্গে জহির রায়হান এসেছেন তা শুনেছিলেন এবং এভাবেই তার চেহারা চিনে নিয়েছিলেন। করিম দারোগা এখন কোথায় থাকেন কেউ ঠিকানা দিতে পারলো না।

আরেকটি ঘটনার কথা জানা যায় জিয়াউল হক খান লোদীর মেয়ে জাহানারা খান লোদীর কাছ থেকে। তৎকালীন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুমিতার স্বামী দীপক গুপ্ত ৩০ জানুয়ারির ঘটনার পাঁচ-ছয় দিন পর নাকি মিরপুরে জহির রায়হান এবং জিয়াউল হক খান লোদীর লাশ পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখেছিলেন।

উল্লিখিত দুটি কাহিনীর মত আরও অনেক কাহিনীর জন্ম হয়েছিল সে সময়। মূল ঘটনা চাপা পড়ে গিয়েছিল বিভ্রান্তি আর অর্ধসত্য ঘটনার মধ্যে। তবে জহির রায়হান সহ ৩০ জানুয়ারির ঐ যুদ্ধের মধ্যে পড়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা কিংবা পুলিশের সদস্যদের প্রায় সবাই শহীদ হয়েছিলেন এটাই সত্য। সে সময় সঠিকভাবে তদন্ত করলে নিশ্চয়ই ২৯ বছর ধরে জহির রায়হানের ঘটনাকে একটা মিথ্যি বানিয়ে রাখা যেত না। জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদের অনেকেরই দৃঢ় ধারণা, মিরপুরে ঐ ঘটনার পেছনে রয়েছে পরিকল্পিত চক্রান্ত। জিয়াউল হক লোদীর মেয়েও মনে করেন, এই ঘটনার আড়ালেও ঘটনা ছিল।

১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেস ক্লাবে জহির রায়হান এক প্রেস কনফারেন্সে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের পেছনের নীল নকশা উদঘাটনসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অনেক গোপন ঘটনার নথিপত্র তার কাছে আছে যা তিনি প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই করে নেয়া অনেক মন্ত্রীর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েও তিনি ডকুমেন্টস সংগ্রহ করেছেন বলে কনফারেন্সে বলেছিলেন। এই হুমকিই তার জীবনের জন্য পাল্টা হুমকি হয়েছিল কিনা আজ কে বলবে?

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২'র এ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'জহির রায়হানের খোঁজ চলছে.. রহস্যজনক ফোন আসছে' শিরোনামে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নিখোঁজ জহির রায়হানের অনুসন্ধানের জন্য মিরপুরে ব্যাপক তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। ...ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু, রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ ও মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা আলাদাভাবে দুটো বৈঠকে মিলিত হন। ...অথচ এর মধ্যেও আসছে টেলিফোনে অজ্ঞাত পরিচয় মহলের নানা ধরনের হুমকি।'

এসব পুরনো খবরের পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে মনে হবে এক জীবন্ত মানুষের জন্যে রাষ্ট্র, পত্রিকা বা মানুষজনের চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু এসব ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলো কেন এবং তা নিরুত্তর রয়ে গেল কেন?

নিরুত্তর থেকে গেল তারপরের ২৯ বছরও। মিরপুরের বধ্যভূমির অস্থিগুলো আবারও প্রশ্ন তুলেছে, আবার তা নিরুত্তর থেকে যাবে।

... ...

মিরপুরের এই নতুন বধ্যভূমির অস্থিগুলোকে সামনে রেখে নতুন করে আমিও অতীত ঘুরে পিতার অস্তিত্ব সন্ধান করলাম। এক সময় মনে হতো পিতা এসে দাঁড়াবেন, আমার মাথায় হাত রাখবেন। আমি মিরপুরের বধ্যভূমিতে পাওয়া একটি মাথার খুলির উপর হাত রেখে চিহ্নিত করতে চাইলাম পিতাকে। হয়তো একই করোটিতে হাত রাখবে আরও কয়েকশ'জন কয়েক সহস্রজন। বলবে এ আমার পিতা। এইতো আমার ভাই, এইতো আমার বোন...

ছবি : [illegible]